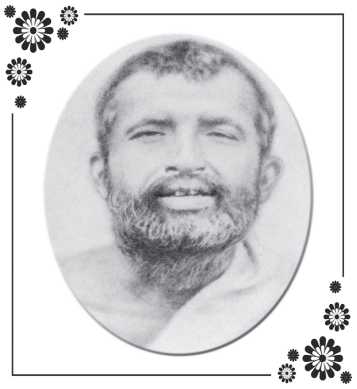

জগন্নাথবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ

শুভাশিস ঘোষ

অবতারপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি : ''যেমন রাজা সেজে-গুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঢেঁড়া পিটে নগর দেখতে বেরোন, আবার কখন ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কার্যকলাপ দেখবার জন্য বেরোন এবং যেই প্রজারা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাকে—'ইনিই রাজা—ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন', অমনি সেখান হতে পালান, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জানবি।''[১]

গুপ্ত অথবা ব্যক্ত যেভাবেই আসুন না কেন, অল্পবুদ্ধি মানব ভগবানের অক্ষয়, অনুপম, পরমাত্মস্বরূপ না জেনে প্রপঞ্চাতীত তাঁকে প্রাকৃত মানুষ বলে মনে করে—

''অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥''[২]

তাই অবতার যখন আসেন, মানুষ তাঁকে কতটা চিনতে পারছে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা তাতেই নিরূপিত হয়, মানুষের চিন্তা কতটা শুদ্ধ হয়েছে। মানবচিত্ত যেখানে যত বেশি শুদ্ধ ভগবানের প্রকাশ সেখানে তত বেশি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর কাছে আপন অবতারত্বের কথায় বলতেন, ''রাজা যেমন প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্য ছদ্মবেশে শহর দেখতে বেরোয়, এবার সেই রকম জানবি।''[৩]

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় : ''বাস্তবিকই তিনি ভগবান, জীবের দুঃখে দেহধারণ করে এসেছিলেন—রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে যান।''[৪]

দরিদ্র মূর্খ ব্রাহ্মণের সেই ছদ্মবেশ সরে গিয়ে কখনও কখনও বেরিয়ে এসেছে তাঁর রাজকীয় স্বরূপ। রাজার রাজা—জগতের নাথ তিনি। রূপ থেকে স্বরূপে তাঁর এই যাতায়াত ঘটেছে বার বার।

কামারপুকুর! শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও বাল্য লীলাভূমি।

বর্ধমান থেকে একটি রাস্তা কামারপুকুর হয়ে পুরীধাম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ওই পথে বহু যাত্রী এবং সাধু শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে যেতেন।[৫] একটি ঘটনা একে শ্রীক্ষেত্রের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদায় ভূষিত করেছে। শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর কলমে : ''মাতাঠাকুরাণীর কামারপুকুরে অবস্থানকালে গৌরীমা আর একবার তথায় গিয়াছিলেন। একদিন হালদার-পুকুরের নিকটে তিনি দেখেন, জনৈক বৃদ্ধ সাধু অবসন্নদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। গৌরীমাকে দেখিয়া তিনি ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,

—এ মায়ি, জগন্নাথজী কতদূর? আর কত পথ হাঁটলে প্রভুর দর্শন মিলবে?

''দেখিয়াই মনে হইল, অনাহার ও পথশ্রমে সাধু ক্লান্ত, আর পথ চলিতে অক্ষম। কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমাকে তিনি জানাইলেন,—রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, পদ্মপলাশলোচন, এক দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, কেন উপবাসে কষ্ট পাইতেছ? আমিই জগন্নাথ, এখানে আছি; আমায় দর্শন কর, প্রসাদ খাও।

''বিবরণ শুনিয়া গৌরীমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়, বলেন,—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এখানে এক সাধুমায়ী আছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসি।

''তিনি দ্রুতপদে মায়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—ও মা, শুনেছো তোমার কত্তার কাণ্ড! এক সাধুর কাছে কামারপুকুরকেই শ্রীক্ষেত্র বলে প্রচার কচ্ছেন!

''সব শুনিয়া মা বলিলেন,—তাঁকে তুমি নিয়ে এসো।

''গৌরীমা সাধুকে লইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার পর গৃহদেবতা রঘুবীরকে দেখাইয়া মা বলেন,—আপনি যাঁর দর্শন পেয়েছেন, ইনিই তিনি, ইনিই জগন্নাথ। আপনি এঁর প্রসাদ গ্রহণ করুন।

''সাধু প্রশ্ন করিলেন,—এ মায়ি, ইনি আর জগন্নাথদেব কি অভেদ? এঁর প্রসাদ গ্রহণ করলেই কি আমার জগন্নাথদেবেরই প্রসাদ পাওয়া হবে? আপনি বলুন আমাকে।

''মাতা পুনরায় বলিলেন,—হাঁ বাবা, জগন্নাথ আর ইনি অভেদ। জগন্নাথের প্রসাদ আর এঁর প্রসাদ এক, কোন পার্থক্য নেই। ইনিই আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে প্রসাদ পেতে বলেছেন। এই কথা বলিয়া মা প্রসাদ লইয়া আসিলেন।

''গৌরীমা এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন, এখন সাধুকে বলিলেন,—মনে আপনি দ্বিধা রাখবেন না, দুই-ই এক। আর ইনি মা কমলা, এঁর হাতের প্রসাদ পাওয়া মহাভাগ্যের কথা।

''সাধুর মনে আর কোন সংশয় রহিল না। এইবার তিনি ভক্তিভরে 'গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি' বলিতে বলিতে মহাপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে তাহা গ্রহণ করিলেন। এবং তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সাধু পুনরায় শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে যাত্রা করেন।''[৬]

ভগবান শিশুর মতো। যে তাঁকে ভালবেসে চায় তিনি তার কাছেই দুহাত বাড়িয়ে আসেন। আবার তাঁরও এমনই অমোঘ টান যে, তিনি যাকে চান, সেই ভাগ্যবান মুহূর্তের মধ্যে তাঁর প্রসারিত দুবাহুর মধ্যে গিয়ে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : ''কখনো ভগবান চুম্বক ভক্ত ছুঁচ, আবার কখনো ভক্ত চুম্বক ভগবান ছুঁচ হন।'' বাস্তবে আমরা তাই দেখতে পাই, ভক্ত-ভগবানের মিলন যুগে যুগে এ-দুই উপায়েই ঘটে থাকে। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে কখনও ভগবান এগিয়ে আসেন। আবার কখনও ভগবানের আকর্ষণে ভক্ত ছুটে চলে তাঁর দিকে। এই আসা এবং আকর্ষণেরই যুগপৎ মূর্ত বিগ্রহ দারুব্রহ্ম জগন্নাথ—বিচ্ছেদের তীব্র বেদনায় বিস্ফারিত দুই চোখ, প্রসারিত বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গনের আকুল আকুতি নিয়ে সুউচ্চ বেদিকায় দণ্ডায়মান। এ-বিগ্রহ আমাদের দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মর্মন্তুদ আর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর নিজের ভাষায় : ''যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না।' বলিয়া চিৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম!''[৭]

প্রশ্ন জাগে, কাদের প্রতি এই আহ্বান? কাদের না দেখে তিনি থাকতে পারছেন না? শ্রীরামকৃষ্ণ

নিজেই বলেছেন, ''মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কিনা সন্দেহ; সখা সখার সহিত এবং প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনো ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই।''[৮]

তবে কার প্রতি, কার এই আহ্বান? এইখানেই তিনি উন্মোচন করে দিলেন তাঁর ভগবৎসত্তার উপরের মানুষী আড়ালটিকে। বলতে চাইলেন, অন্য কারও সঙ্গে নয়, এই বিচ্ছেদ আমার সঙ্গে আমারই বিচ্ছেদ; এই বিরহ আমার প্রতি আমারই বিরহ; এই যন্ত্রণা আমারই জন্য আমার যন্ত্রণা। যেন সত্তার ভাঙন। যেন অঙ্গহানি। এর সমর্থন পাই পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতে থাকা ভক্তদের পরিচয়ে : ''ঠাকুর বলতেন, তারা কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকূপ থেকে, কেউ হাত-পা থেকে বেরিয়েছে।''[৯]

বস্তুত আমরা সকলেই—জীবমাত্রেই তাঁর শরীরের অংশ, তাঁর সত্তা—

''সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥''[১০]

—তিনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত। সকল শরীরের হস্তপদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ তাঁরই হস্তপদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ।

''বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্''[১১]—জগতকে তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন।

এই ছড়ানো অস্তিত্ব—এই হারানো সত্তা ফিরে পাওয়ার জন্যই জগন্নাথবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের ওই ক্রন্দন। মানবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে বিশ্বমানবের প্রতি এই আকুল আহ্বান।

জগন্নাথস্তোত্রে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের আবাসস্থলের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—''মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে/ বসন্ প্রাসাদান্তঃ...''—মহাসাগরের তীরে তাঁর বাস। মানবসাগরই এই মহাসাগর।

সেখানে সুবর্ণাভ অর্থাৎ দিব্য নীলাচলশিখরে প্রাসাদের মধ্যে বাস করেন তিনি। সেই প্রাসাদ পুরীর চতুর্দ্বার বিশিষ্ট শ্রীজগন্নাথ মন্দির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেরও চারটি দরজা।

ঠাকুরের স্থূল শরীর ত্যাগের অনেক পরে—তাঁর কঠোর তপস্বী শিষ্য শুকদেবতুল্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী একবার পুরী গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন দিনের বেলা জগন্নাথদর্শনে যান। তিনি ''সিংহদ্বারের রজঃ মস্তকে ধারণ ও প্রণাম করিয়া যেই মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন অমনি দেখিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময় দেহে উপরে দাঁড়াইয়া আছেন অষ্টাদশ সোপানে, দ্বিতীয় ফটকের সম্মুখে। আনন্দে আপ্লুত হইয়া স্বীয় গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া যেই উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার আর দর্শন পাইলেন না।''[১২]

অন্যত্র উল্লেখ পাই, তিনি ''অরুণ স্তম্ভের পাশ দিয়া মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, সিঁড়ির অন্য পাশ দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামিতেছেন। ঠাকুরের গলায় ফুলের মালা এবং দেহে সাধারণ জামা-কাপড়। ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তিনি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রণামান্তে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন তখন ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার চমক ভাঙিল। হরি মহারাজ বলিতেন, 'জগন্নাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ।''[১৩] বুঝলেন দক্ষিণেশ্বরের সারদাপতিই জগৎপতিরূপে এখানে বাস করছেন।

তবে স্থূলশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও পুরী যাননি। বলেছিলেন, ''পুরী গেলে শরীর চলে যাবে ঐ (চৈতন্যদেবের) উচ্চ মহাভাবে''[১৪] অর্থাৎ পূর্বলীলাস্থলে পূর্ব স্মৃতির স্মরণ হবে, যা এই শরীর ধারণ করতে পারবে না। নরেন্দ্রকে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, ''এই যে লোক 'গৌর গৌর' করে, সেই গৌর আমি।''[১৫] মাস্টারমশাই (শ্রীম) বলছেন,

''ঠাকুর আমাকে নিজে বলেছেন, আমিই পুরীর জগন্নাথ।''[১৬]

এভাবে খুব স্পষ্টকরেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিচয়—মহাপ্রভু তিনি! জগন্নাথক্ষেত্র আলো করে বসে রয়েছেন! এই আলোকিত রূপটিই শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তাঁর পুরী ভ্রমণকালে। জগন্নাথ দর্শন করে মা বলেছিলেন, ''জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।''[১৭]

ইঙ্গিতটি বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যিনি স্বয়ং মহামায়া—মায়ার দ্বার বন্ধ করে যিনি জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছেন, আবার সেই দ্বার খুলে দেওয়ার চাবিকাঠিটিও যাঁর হাতে; বিশ্বসংসারের যিনি পরিচালিকা—তিনি দাসী হবেন কার? উপনিষদ বলছেন, ''মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।''[১৮]—মায়াকে প্রকৃতি বলে জানবে, আর এই প্রকৃতিকে যিনি চালাচ্ছেন সেই পরমেশ্বরকে জানবে মায়াধীশ। 'মায়াধীশ' অর্থাৎ মায়া যাঁর অধীন। মায়াধীশ বলেই ঠাকুর তাঁর পদসংবাহনরতা শ্রীশ্রীমাকে দেখেছেন 'মন্দিরের মা' এবং তাঁকে মা দেখছেন 'পুরুষসিংহ'। এই পুরুষসিংহেরই এক অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন 'শ্রীম' কথামৃতের পাতায় :

''ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন! আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ! অবাক হইয়া মাস্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন।''[১৯]

আবার এই পুরুষসিংহ, আত্মারাম যিনি, মহামায়া যাঁর অধীন, তিনিও কিছু স্বাধীন নন—

''অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুর্ভিগ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥''[২০]

—আমি ভক্তের অধীন সুতরাং পরাধীন। আমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। সাধুভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করে আছেন। আমি ভক্তের প্রিয়, ভক্ত আমার প্রিয়।

এই কারণেই জগন্নাথবিগ্রহে দেখতে পাই, রাজাধিরাজ সেজে তিনি যেমন সিংহাসনে বসে রয়েছেন, তেমনি আবার ভক্তের ভালবাসার কাঙাল সেজে বাড়িয়ে রয়েছেন দুই হাত।

তাই শরীর থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় পাঁচ-ছবার মাস্টারমশাইকে জগন্নাথক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। পাঠানো তো নয়, এ যেন ডেকে পাঠানো। যেন নিজের কাছে নিজেই ডেকে আনা। আবার আনেনও এমন সময় যখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় ভক্তকে। আসলে ভগবান দেখেন ভক্তের হৃদয়ের টানটুকু। তিনি বলেন—''ভক্তি অমনি করলেই আমাকে পাওয়া যায় না। চাই প্রেমাভক্তি।'' এই প্রেমাভক্তির অসীম সাহসী রূপটি আমরা দেখতে পাই শ্রীম-র জীবনে। তাঁর নিজের ভাষায়—

''একবার (ঠাকুর আমায়) বলে দিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে। মহা ভাবনায় পড়লাম কি করে হয়! তখন আলিঙ্গনের সময় নয়। শেষে এক বুদ্ধি তিনি মনে জাগ্রত করে দিলেন। অনেকগুলি রেজকি পয়সা, কিছু টাকাও ছিল, পকেটে করে নিয়ে গিয়ে সব নিচে ছড়িয়ে ফেললাম গর্ভমন্দিরে। পাণ্ডারা সব ঐ সব কুড়ুচ্ছিল আর আমি এই ফাঁকে রত্নবেদিতে উঠে আলিঙ্গন করলাম। কেউ কেউ দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। আমি ফস্ করে নেমে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারলে না—কে!''[২১]

এক পক্ষের জড়বৎ নিষ্ক্রিয়তা আর যাই হোক আলিঙ্গনকে সম্পন্ন করে না। তাই মাস্টারমশাই ফিরে এলে ঠাকুর তাঁকে প্রত্যালিঙ্গন করেছিলেন। গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলেছিলেন—''এই

আমারও জগন্নাথকে আলিঙ্গন করা হলো।”[২২]

জগন্নাথ-মহিমায় উজ্জ্বল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ এক অপূর্ব লীলা! সেই সঙ্গে নিজেকে আড়াল করবার কী সুনিপুণ প্রয়াস!

শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্নাথলীলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাগবাজারের বসু পরিবারের বলরাম বসুর নাম। গভীর জগন্নাথ-প্রীতি তাঁর। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, ‘‘প্রথম কন্যার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা ঁপুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।”[২৩]

বলরাম যেদিন চলে আসেন, ভক্তের বিচ্ছেদবেদনা সেদিন ভগবানকে কাতর করেছিল নিশ্চয়ই। জগন্নাথের আসন সেদিন নিশ্চয়ই টলে গিয়েছিল। তাই পুরীতে তাঁর শ্রীমন্দিরে যিনি প্রত্যহ যেতেন, এবার কলকাতায় সেই বলরাম-গৃহে শুরু হল তাঁর নিত্য যাতায়াত। বলরাম সম্পর্কে লীলাপ্রসঙ্গকার আরও লিখেছেন, ‘‘এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন। বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ... করিয়াছিলেন।”[২৪]

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আগেই। চলছিল নিত্যসেবা। সেবায় প্রসন্ন ভগবান এবার ঝলমল করে উঠলেন। ঠাকুর বলতেন, ‘‘বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।”[২৫] বলতেন, ‘‘বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা।” লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন, ‘‘কর্তা গিন্নি হইতে বাটীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জল গ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ।”[২৬] এহেন পরিবারে শুধু অন্নসেবাই নয়, কখনও কখনও রাত্রিবাসও করতেন ঠাকুর।

যেহেতু জগন্নাথের সেবা, ‘‘কাজেই রথের সময় রথটানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই।... ছোট একখানি রথ, বাহির বাটীর দোতলার চক্‌মিলান বারাণ্ডায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত—একদল কীর্তনীয়া আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে?”[২৭]

স্বামী সারদানন্দ সে-বাড়িতে ১৮৮৫ সালে উলটোরথের উৎসব দেখেছিলেন। সেইদিনকার অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—‘‘সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ঁজগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত...।”[২৮]

উল্লেখ্য, ওই বছরই সোজারথে ঠাকুর মাহেশে গিয়েছিলেন। কয়েকজনের একটি ছোট দল তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী হরিপদবাবু জানিয়েছেন : ''মাহেশে লোকের ভিড় দেখে তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) দোতলায় রাখা হল। বাড়িটি ত্রিতল [বর্তমানে বাড়িটির অস্তিত্ব নেই];... দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি রথ দেখছেন। বলরাম সুভদ্রা, জগন্নাথ তিন ঠাকুর রথে উঠলেন—শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা বাজনা সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল—চারিদিকে হরিধ্বনি। ঠাকুর একেবারে নিচে নেমে ফটকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিড় আগলাবার জন্য আমরা সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। রথ টানবার জন্য গৌড়গয়লারা এসে রথের দড়ি ধরেছে—টান পড়বে—যাত্রীরাও দড়ি ধরেছে এমন সময় ঠাকুর আমাদের ঠেলে ছিটকে তীরের মতো রথের দিকে ছুটে গেলেন। আমরা পেছনে ছুটে চললাম। এদিকে ঠাকুর একেবারে ভিতরে রথের চাকার কাছে জোড় হাতে জগন্নাথ দর্শন করে চোখের জলে ভাসছেন। আমরা কাছে গিয়েও ভিড় ঠেলে ভিতরে যেতে পারছি না। প্রায় জন পঞ্চাশ গৌড়গয়লারা যারা রথ টানে একেবারে ভিতরে ঠাকুরকে ঘিরে দাঁড়াল। রথটানা স্থগিত হল। আমরা নিকটেই দেখছি—ঠাকুর যুক্তকরে বলছেন 'তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি। জগবাহির নহি মুঞি ছার। প্রভু তুমি জগন্নাথ—জগতের নাথ, আমি কি জগৎ ছাড়া।' সে অপূর্ব ভাব!''[২৯]

গরুড়স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেবের জগন্নাথ দর্শনের কথা আমরা জানি। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন বিগ্রহের দিকে; চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অনুক্ষণ সেই মর্মস্পর্শী আর্তি :

''নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব
নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥''[৩০]

—তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতে কখন আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে এবং শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হবে!

এ যেন নিজেরই নিজেকে দেখা; নিজেরই রূপে মুগ্ধ হয়ে অনিমেষ চেয়ে থাকা। ভগবানকে দেখে আশ না মেটার এমন দিব্য নিদর্শন নবনীলাচল মাহেশের রথে উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

হরিপদবাবুর স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানতে পারি : ''... নিমেষ মধ্যে রটে গেল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস ঠাকুর এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে আবার লোকের ভিড় জমে গেল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ—একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা নাই।... চারদিকে 'জয় জগন্নাথ'—'হরিবোল হরিবোল' তুমুল ধ্বনি উঠছে। কিন্তু ঠাকুরকে বাহিরে নিয়ে আসা কঠিন। একে মহাভাবে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য—মুখে আনন্দের হাসি, চক্ষুতে অশ্রুর প্রবাহ, কম্প রোমাঞ্চ আবার স্থাণুর মতো স্থির। আবার তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভিড়। গোয়ালাদের সাহায্যে কোনওরকমে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। চারিদিকে হরিধ্বনি, লোক জমায়েত হতে লাগল—গৌড়দের সাহায্যে কোনওরকমে বাড়িতে আনা গেল।...

''ঠাকুর দুপা যান টলে টলে চলেন আবার স্থির গম্ভীরভাবে দাঁড়ান। রথ চলতে আরম্ভ হল—চারিদিকে কাঁসর ঘণ্টা বাজনা বেজে উঠল—জনতা রথের সঙ্গে চলল, স্থানটি নীরব নিঝুম হল কিন্তু আশ্চর্য ঠাকুরের ভাব ভঙ্গ হয় না। সূর্য অস্ত গেলে প্রায় গোধুলির সময় ঠাকুর ধীরে ধীরে সহজ অবস্থায় এলেন।''

বাইরে ধাতব রথ। বাড়ির ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহরথ। সেই রথে সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন সেখানে উপস্থিত ভাগ্যবান কজন। সেদিন তিনতলায় গোলাপমা খিচুড়ি রান্না করেছিলেন। সম্ভবত ঠাকুরই তা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল পরবর্তী কালে লিখেছেন, ''আজীবন কার্যকলাপ যাঁর সবই নূতন, তাঁর খিচুড়ি খাইবার ইচ্ছাও এক নূতন

ব্যাপার।... ভাবী কালে... প্রভুর... অর্চনস্থানকে দ্বিতীয় জগন্নাথক্ষেত্রে (যথায় ভেদভাব ভুলিয়া সকল বর্ণই একসঙ্গে প্রসাদ পায়) পরিণত করিবেন ভাবিয়া দক্ষিণেশ্বর-ভূষণ প্রভু এক অভিনব সুখসাধ্য খেচরান্ন ভোজনের ইচ্ছা করিলেন। তাই প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ প্রভুর জন্মোৎসবে তাঁহারই অভীপ্সিত খেচরান্ন দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপের এরূপ বিরাট ভোগের ব্যবস্থা করেন...।"[৩১]

যাইহোক, সেদিন ভাবমুখে থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুই খেতে পারলেন না।

উলটো রথের পরের দিন। বলরাম বসুর বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিমদিকের ছোট ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। সকালের রোদ জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে মাস্টার, বলরাম প্রভৃতি দু-একজন ভক্ত। আগের দিনের পুণ্য স্মৃতির সৌরভ এখনও সমস্ত বাড়িময় ছড়িয়ে। তারই রেশ টানতে গিয়ে ঠাকুর ভাবে বিভোর—শ্রীশ্রীজগন্নাথের কাছে আর্তি জানাচ্ছেন—''জগন্নাথ! জগবন্ধু! দীনবন্ধু! আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর!"[৩২] বুঝি জগন্নাথের কাছে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় শেখাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি একটু সরে এলেন। গলার স্বর নিচু। বললেন, ''তোমাদের অতি গুহ্যকথা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল। জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।' "[৩৩]

'মধুরভাবে আলিঙ্গন!'—এর রহস্য বোধ হয় স্বরূপে ফিরে যাবার তীব্র আকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর স্বরূপে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন জগন্নাথ স্বরূপে! আর সেই স্বরূপটিকে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীমা—ঠাকুরের মরতনু ত্যাগের পরে। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসে সে এক অপূর্ব ঘটনা। রথযাত্রার দিন। বাগবাজারে মায়ের বাড়ি মা বসে রয়েছেন তক্তপোশে। পাশের ঘরে রথে বসানো হল ঠাকুরের পট। পাশের ঘর থেকে ঠাকুরকে রথে উঠতে দেখে মা অনিমেষনয়নে তাঁকে দেখতে দেখতে কতই না আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন! পরে ভক্তেরা মিলে রথসুদ্ধ ঠাকুরকে ধরে রাস্তায় নিয়ে গেলেন। সামনের রাস্তায় যখন রথ টানা হচ্ছে, মা বললেন, ''সকলে তো জগন্নাথ যেতে পারে না। যারা এখানে (ঠাকুরকে রথে) দর্শন করলে, তাদেরও হবে।"[৩৪]

কী শান্ত অথচ দৃঢ় উক্তি! সত্য ও আশ্বাসের কী মহান মিশ্র আলোকসম্পাত! মুহূর্তে বিশ্বাসের স্বর্ণচূড়ায় তুলে ধরে মনকে। যেখানে সে অনায়াসে বলতে পারে—'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ'!! যা শুধু কথার কথা নয়।

জগন্নাথস্তোত্রে শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বোক্ত শ্লোকের শেষে লিখেছেন—'সকলসুরসেবাবসরদো' অর্থাৎ, তিনি সকল দেবগণকে তাঁর মহান সেবার অবসর দান করেন।

জগন্নাথের সেবা বস্তুত জগতেরই সেবা। আত্মসেবায় মগ্ন মানুষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না জগন্নাথ তথা জগৎসেবার অবসর তার কোথায়। তাই দেবভাবসম্পন্ন তাঁর পরম অন্তরঙ্গকে দিয়ে মানবগণকে আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত সংসারের অসারত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্বের উপলব্ধি করিয়ে তিনি সেই শুভ অবসরের সন্ধান দেন। এইরকমই এক অবসরলাভের চিত্র পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্ত মনোমোহনের জীবনে।

''...কন্যার মৃত্যুশোক পিতাকে আচ্ছন্ন করিতে না পারিলেও মাতার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। তিনি শোকে শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে ক্রমে 'মেলান্‌কলিয়া' রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না, (ঠাকুরের সেবা ব্যতীত) সংসারের কোনও

কাজকর্মের ভার গ্রহণ করেন না। সর্বদাই বিমর্ষ; দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার দিনগুলি কাটিয়া যায়। ডাক্তার বৈদ্যগণ স্থান পরিবর্তনের আদেশ করিলেন। মনোমোহন সস্ত্রীক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন।...

''পুরীধামে পৌঁছিয়াই মনোমোহন যখন ধূলাপায়ে সরাসরি জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন তিনি মন্দির মধ্যে জগন্নাথ দেবের মূর্তির পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি দেখিলেন। যতবার ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন ততবারই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তখন তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'জয় জগন্নাথ রামকৃষ্ণ রূপধারী।'...

''সেখানে গিয়াও তাঁহার (মনোমোহন-পত্নীর) মনের কোনও পরিবর্তন হইল না, তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে দারুণ বিসূচিকা রোগ আসিয়া অধরমোহিনীকে আক্রমণ করিল। মনোমোহন সেবা-শুশ্রূষার বা চিকিৎসার ত্রুটি করিলেন না। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ঠাকুরের নাম শুনাইতে লাগিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতেও মনোমোহন অচল অটল ও নির্ব্বিকার রহিলেন।''[৩৫]

স্ত্রীর শ্রাদ্ধবাসরে মনোমোহনের অদ্ভুত ভাব লক্ষ করে তার কারণ জানতে চাওয়ায় মনোমোহন বলেছিলেন, ''আজ আমার মহামায়ার গুরু নিপাত হইয়াছে। আজ আমি বন্ধনমুক্ত।''[৩৬] সে-বন্ধনমুক্তি মনোমোহনের জীবনে এনে দিয়েছিল জগৎ তথা রামকৃষ্ণ রূপধারী জগন্নাথ-সেবার পূর্ণ অবসর।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন উড়িষ্যা ছিল এমনই এক অঞ্চল যেখানে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ এদের সহাবস্থান ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সর্বধর্মসমন্বয়ের এমন এক অনুকূল পরিবেশ, যেখানে জগন্নাথ-সংস্কৃতির শিকড় উড়িষ্যাবাসী থেকে বহু হিন্দু ভারতবাসীর মনন ও বিশ্বাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে পুনরায় এক সংস্কৃতি সমগ্র জগদ্‌বাসীর মনে রোপণ করে চলেছে মহাসর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ। সে-সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ স্বয়ং জগন্নাথবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনি স্বয়ং ধরা দিতে এলেও সাধনহীন, সংশয়াচ্ছন্ন আমরা তাঁকে ধরতে পারি না। তাই তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা :

''জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'' ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *ভারতে শক্তিপূজা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৪), পৃঃ ৩২
২। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৭।২৪
৩। *ভারতে শক্তিপূজা*, পৃঃ ২৬, পাদটীকা
৪। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩), অখণ্ড, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯
৫। দ্রঃ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮), ভাগ ১, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃঃ ১৪ [এরপর, *লীলাপ্রসঙ্গ*]
৬। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা-রামকৃষ্ণ* (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম : কলকাতা, ১৩৬১), পৃঃ ১৭৫-৭৭
৭। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ২১৮
৮। তদেব
৯। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ২১২
১০। *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* ১৩।১৪
১১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৩।৭
১২। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, *শ্রীম-দর্শন* (শ্রীম ট্রাস্ট : চণ্ডীগড়, ২০০৯), ভাগ ১৪, পৃঃ ১৯৭
১৩। স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ২০
১৪। *শ্রীম-দর্শন*, ভাগ ১৪, পৃঃ ৭২

১৫। তদেব
১৬। তদেব
১৭। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ১৩৭
১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।১০
১৯। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৩২
২০। *শ্রীমদ্ভাগবত* ৯।৪।৬৩
২১। *শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে*, পৃঃ ১৯
২২। তদেব, পৃঃ ২০
২৩। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ২, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৭০-৭১
২৪। তদেব, পৃঃ ১৭১
২৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮), অখণ্ড, পৃঃ ৪৭৮
২৬। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ২, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ), পৃঃ ১৪০
২৭। তদেব, পৃঃ ১৪১
২৮। তদেব
২৯। 'উদ্বোধন' পত্রিকা (আশ্বিন ১৩৬৩), ৫৮ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৫২-৫৫৩
৩০। শ্রীচৈতন্যদেব, *শিক্ষাষ্টকম্*
৩১। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, সম্পাদনা : অসীম চট্টোপাধ্যায় (রূপকথা : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ১৭৫
৩২। কথামৃত, অখণ্ড, পৃঃ ৮৬৮
৩৩। তদেব, পৃঃ ৮৬৯
৩৪। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ১৪
৩৫। *ভক্ত মনোমোহন* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫১), পৃঃ ২৪৪
৩৬। তদেব, পৃঃ ২৪৬

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

* *The Divine Legacy* (ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা, পৃঃ ৩১৬, মূল্য : ২০০ টাকা)

* *Sister Nivedita in Contemporary Newspapers* (পাশ্চাত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং তাঁর বক্তৃতাবলির সংকলন আলোচনা সহ, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, পৃঃ ২৫৬, মূল্য : ৩০০ টাকা)

* *নিবেদিতা-বর্ণালি* (ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা, পৃঃ ১১০, মূল্য : ৪০ টাকা)